কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সদর - অন্দর

বিদ্যুৎ হালদার

নদিয়া জেলার প্রাচীন জনপদ কৃষ্ণনগর। অতীতে এখানকার নাম ছিল রেউই। রাজা রাঘব রায় নদিয়া রাজধানী মাটিয়ারী গ্রাম থেকে স্থানান্তরিত করে রেউই গ্রামে আনেন। এই রাজবংশেরই অন্যতম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০ - ১৭৮২)। তিনি ১৭২৮ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সেই নদিয়া রাজ হন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামানুসারে নয়, তার রাজত্বকালের অনেক আগেই এই রাজবংশেরই রাজা রুদ্র রায় এখানকার মূল আদিবাসী কৃষ্ণভক্ত গোপদের সম্মানিত করে রেউই গ্রামের নাম বদলে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন। এই কৃষ্ণনগর শহরে মৃৎশিল্পের কথা আজ আর কারও অজানা নয়। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প অতীতকাল থেকে তার সুখ্যাতি আদায় করে নিয়েছে। এখানকার মানুষের মুখে এখনও শুনতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণনগরের রাজারা নাকি পূর্ববঙ্গের নাটোর থেকে মৃৎশিল্পীদের এনে, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ ও প্রসারলাভে সহায়তা করেছিলেন এ-নিয়ে কারও কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। তাছাড়া কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৎকালীন ইংরেজ সাহেবদের অবদান স্বীকার করতেই হবে।

কৃষ্ণনগরের মূলত তিনটি অঞ্চলে মৃৎশিল্পের চর্চা দেখতে পাওয়া যায় — ঘূর্ণী, ষষ্ঠীতলা এবং নতুন বাজার। এছাড়া কৃষ্ণনগরের অন্যান্য পাড়ায় মৃৎশিল্পীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ষষ্ঠীতলার একটা অংশের পূর্বনাম ছিল কুমোরপাড়া এবং বর্তমানে নতুন বাজারের নতুন নাম হয়েছে পালপাড়া নতুনবাজার। পত্র - পত্রিকায় শুধু পালপাড়া দেখলে ভাতজাংলা পালপাড়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। ভাতজাংলা - পালপাড়াতেও মাটির কাজ হয়, তবে তা প্রতিমা বা পুতুল নয় — সরা, গ্লাস ইত্যাদি অন্যকিছু। এখন যারা কৃষ্ণনগরের প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী তাদের অনেকের বাড়িতেই অতীতে একসময় কুমোর চাক ঘুরত। এমনকী কোলকাতার কুমোরটুলিও একদিন শুধু আজকের মতো প্রতিমা তৈরির জন্য ব্যস্ত ছিলনা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শিল্পী নিরঞ্জন পালের মতো কেউ কেউ যখন কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতার কুমোরটুলিতে চলে যান তখন তাঁরা সেখানে ঘরে ঘরে চাক ঘুরতে দেখেছিলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কথায়, 'ঐসব পাড়ার ছোট - বড় নানা ছেলে। সেখানে ক্লাসরুম টেবিল চেয়ার লাইব্রেরি লেকচার হল কিছুই নেই, অথচ দেখা যায় সেখান থেকে পাকা পাকা কারিগর বেরিয়ে আসছে — পুরুষানুক্রমে আজ পর্যন্ত।...খেলতে খেলতে artist, artisan কারিগর শিল্পী হয়ে উঠেছে যেন মন্ত্রবলে।'

কৃষ্ণনগরের সবচেয়ে পুরনো মৃৎশিল্পী হিসাবে শ্রীরাম পাল ও কালাচাঁদ পালের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরাম পাল ও কালাচাঁদ পাল দুজনেই বাস্তব সম্মত ফিগার নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। কোনো ভিক্ষুক বা ফকিরকে সামনে বসিয়ে তাদের অনুকরণে নিমেষে ছোট চোট মূর্তি তৈরি করতে পারতেন দুজনেই। শ্রীরাম পাল ও কালাচাঁদ পালের পরে কৃষ্ণগরের প্রাচীন মৃৎশিল্পী বলতে যদুনাথ পাল, রাখালদাস পাল, বক্রেশ্বর পাল, পরাণচন্দ্র পাল প্রমুখ শিল্পীদের নাম উঠে আসে। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রতিভাবান মৃৎশিল্পী। প্রমথ চৌধুরী তাঁর ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরের যদুপালের খুব নাম ডাক শুনেছিলেন। তিনি তাঁর 'আত্মকথায়' যেমন সেকথা লিখেছিলেন তেমনি যদুপালকে একজন আর্টিস্ট' বলেই উল্লেখ করেছিলেন। এই যদু পাল আসলে যদুনাথ পাল। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন প্রমথ চৌধুরীর দাদা যদুনাথ পালের অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দাদার অনুরোধেই পাল মহাশয় ইংরাজি বইয়ের অনুকরণে 'ভিনাস' গড়তেন। সম্ভবত সেই একই ধরণের ভেনাসই এখনও ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পীদের ঘরে ঘরে দেখতে পাওয়া যায়। এই যদুনাথ পাল ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী। তাঁর শিল্পকাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সব প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এর আগে ১৯১৫ সালে লর্ড কারমাইকেল যখন ছোটলাট তখন তিনি একবার বেড়াতে এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরে এসে তিনি তখনকার বিখ্যাত মৃৎশিল্পী যদুনাথ পালের বাড়িতে একটি ছোট ছেলেকে মাটির কাজ করতে দেখে অবাক হয়েছিলেন। এই ছোট ছেলেটিই পরবর্তীকালের বিখ্যাত মৃৎশিল্পী ও ভাস্কর গোপেশ্বর পাল। গোপেশ্বর পাল ছিলেন মৃৎশিল্পী পরাণচন্দ্র পালের দৌহিত্র। এছাড়া রাখালদাস পাল ছিলেন অতীতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিখ্যাত মৃৎশিল্পী পরাণচন্দ্র পালের দৌহিত্র। এছাড়া রাখালদাস পাল ছিলেন অতীতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিখ্যাত মৃৎশিল্পী। তাঁর মৃৎশিল্প বিশ্বের নানা শিল্পপ্রদর্শনীতে স্থান করে নিয়েছিল। রাখালদাস পালেরই ছেলে বিজয়কৃষ্ণ পালও সুনামের সঙ্গে মাটির কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর ছেলেরা আর এই কাজ করেননি। কারণ ইংরেজ চলে যাওয়ার পর মৃৎশিল্পীদের কদর করবার মতো মানুষের অভাব লক্ষ্য করে বিজয়কৃষ্ণ নিজেই তাঁর ছেলেদের চাকরি নেওয়ার পরমামর্শ দিয়েছিলেন। যদুনাথ পাল ও রাখালদাস পালের পরবর্তী প্রজন্ম মৃৎশিল্প থেকে বিচ্যুত হলেও পরাণচন্দ্র পালের উত্তরপুরুষেরা বংশপরম্পরায় এখনও মৃৎশিল্পের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। পরাণচন্দ্রের দুই পুত্র— সতীশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র। সতীশচন্দ্রের পুত্র নির্মলকৃষ্ণ পালের ছেলে মুক্তি পাল ও শম্ভু পাল ঘূর্ণীর বিখ্যাত মৃৎশিল্পী ছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র পালের ছেলে কার্তিক পাল সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। কার্তিক পালের ছেলে মৃৎশিল্পী ও ভাস্কর গৌতম পাল ইতালি থেকে শিল্পকলা বিষয়ে শুধু শিক্ষা অর্জনই করেননি, তাঁর নির্মিত শিল্পকলা পৌঁছে গিয়েছে দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। সেইসব শিল্পকলার পাথর, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি অন্য মাধ্যমে গঠিত হলেও পরোক্ষে মৃৎশিল্পেরই মর্যাদা বাড়িয়েছে। গৌতম পালের বাবাও ছিলেন একজন স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে একসময় তিনি রবীন্দ্রমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। সেই মূর্তি দেখে কবিগুরু খুশি হয়ে স্বহস্তে শিল্পীকে লিখে দিয়েছিলেন শংসাপত্র।

ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পীদের মধ্যে শুধু কার্তিক পাল নয়— প্রকাশ পাল, বীরেন পাল, মুক্তি পাল, শম্ভু পাল, পশুপতি পাল, জীতেন পাল, করুণাপ্রসাদ পাল এঁরা সকলেই আজ আর বেঁচে নেই। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের মৃৎশিল্পে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখে গিয়েছেন। দেবদেবীর মূর্তিনির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সম্মত নানা বৃত্তি বা পেশার মানবরূপ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন এইসব দক্ষ মৃৎশিল্পীরা। এমনকী

রিলিফ, ম্যুরাল ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁদের নির্মাণশিল্পে। এঁদের কাছে থেকে যারা কাজ শিখেছেন তাঁদের অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, যেমন বীরেন পালের কাছে কাজ করতে তাঁর কাজ অনুপ্রাণিত হয়ে ঘূর্ণী বাগদীপাড়ার মিলন বাগ ও আ.সি. পাড়ার দিলীপ বিশ্বাস, হয়ে উঠেছেন একজন বড়ো শিল্পী। মিলন বাগ একসময় অনেক প্রতিমা গড়েছেন। এখন তিনি ইস্কনের একজন অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত শিল্পী। মিলন বাগের মতো দিলীপ বিশ্বাসের কাজেও শিল্পী বীরেন পালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণনগর রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটু আগে ডান দিকের উন্মুক্ত অঞ্চলে যীশুখ্রীষ্টের জীবনের নানা ঘটনাবলী অবলম্বনে নির্মিত সিমেন্টের মূর্তিগুলি শিল্পী দিলীপ বিশ্বাসের সৃষ্টি। একসময় এ-জাতীয় কাজের একমাত্র বিশেষ পারদর্শী শিল্পী ছিলেন বীরেন পাল। তাঁর নির্মিত দেব - দেবীর মূর্তিগুলিতেও এর প্রভাব পড়েছিল। বীরেন পালের তৈরি মাটির প্রতিমার মোমায়িত মুখ দেখে স্বর্গ নেমে-আসে রূপকথার কোনো পরী মনে হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। বীরেন পালের বাবা নরেন্দ্রনাথ পালও ছিলেন একজন মৃৎশিল্পী। বীরেন পালের মতো মুক্তি পাল ও শম্ভুপালের হাতের কাজও ছিল যথেষ্ট সুন্দর, তবে অন্য ঘরানার। সহোদর দুই শিল্পীর হাতের যাদুস্পর্শে মাটিতে রূপ কীভাবে যেন অরূপ হয়ে উঠত। দুই ভাই-ই বেশিদিন বাঁচেননি। মুক্তি পাল মারা যাওয়ার পর শম্ভু পাল একাই বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তাঁর সে - কাজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে দেশ তথ্য বিশ্বের মানুষ। শম্ভু পাল মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় দশ-বারো-বারো বছর তাঁর কাছে ছিল প্রবীর দত্ত। প্রবীর এখন কৃষ্ণনগরের প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী। প্রবীর মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় দশ-বারো বছর তাঁর কাছে ছিল প্রবীর দত্ত। প্রবীর এখন কৃষ্ণনগরের প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী। প্রবীর ছবি আঁকতেও জানে। সে শম্ভু পালের এক আশ্চর্য আবিষ্কার।

প্রবীর তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। দাদা আশিস দত্তের প্রেরণায় ছোট ছোট মাটির মূর্তি দৈরি করে সবে হাত পাকানো শুরু হয়েছে। সেই সময়ই প্রবীর তৈরি করে ফেলেছে একটা চমৎকার ছোট সরস্বতী মূর্তি। প্রবীরের বাড়িটা রাস্তার একেবারে গা ঘেঁষে হওয়ায় ছোট মূর্তি হলেও রাস্তা চলতি সকলেরই চোখে পড়ে সেই মূর্তি। রাস্তা চলতি অন্যান্য মানুষের মতো শম্ভু পালের চোখ গেল মূর্তিটার। চোখ ফেলে তিনি আর চোখ তুলতে পারে না। একজন প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান শিল্পী আবিষ্কার করলেন ভবিষ্যতের একজন বড়ো শিল্পীকে। শম্ভু পাল প্রবীরকে দেখেশা করতে বলেন তাঁর বাড়িতে। এই বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে মাটির কাজ শিখতে যাওযার সাহস হলো না। বাড়ির কেউ উৎসাহও দিল না এ- ব্যাপারে। এরপর বছর চারেক কেটে গিয়েছে। হায়ারসেকেন্ডারি পরীক্ষা হয়ে গেলই প্রবীর দুরুদুর বক্ষে দেখা করল শিল্পী শম্ভু পালের সঙ্গে। শম্ভু পাল সব শুনে একটা পাজামা আর একটা স্টিলের গ্লাস নিয়ে প্রবীরকে পরদিন থেকে তাঁর বাড়িতে চলে আসতে বলেন। সেই থেকে শম্ভু পালের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রবীর তাঁর কাছে থেকেছে। শম্ভু পাল শুরুতেই শিক্ষার্থীকে বলেছেন — কোনো মূর্তি বানানোর সময় আয়নায় নিজেকে দেখবে, আর সেই ভাব মাটিতে আনার চেষ্টা করবে। তিনি আরও বলেছিলেন— মনে রাখবে, নিজেই নিজের সবচেয়ে বড়ো মডেল। পরের দিকে গুরু শিষ্যকে অনেককিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আধুনিক রঙের ব্যবহারের মতো কোনো কোনো বিষয়ে অনেকসময় শিষ্যকে বেশি প্রাধান্য দিতেও সংকোচ করেন গুরু। প্রবীর কে শম্ভু পাল ছেলের মতো স্নেহ করতেন। বার বার বলা সত্বেও প্রবীর কোনো দিন কোনো অর্থ গ্রহণ করেনি গুরুর কাছ থেকে। বরং ব্যাঙ্কের চাকরি ঠেকিয়ে সে বারে বারে ছুটে গিয়েছে গুরুর কাছে মৃৎশিল্পের অমোঘ আকর্ষণে। প্রবীর দত্ত ও শুভেন্দু মণ্ডল দুজনেরই বাড়ি কাঠুরিয়াপাড়া। ষষ্ঠীতলার কুমোরপাড়ার নিমাই পালের ভাই বীরেন (বেল) পাল, মুক্তি পাল ও শম্ভু পালের ঘরে কাজ করতেন। তিনি ও একজন মৃৎশিল্পী।

ঘূর্ণীর পুরনো মৃৎশিল্পীদের মধ্যে বেঁচে আছে একমাত্র গণেশ পাল। তাঁর বয়স ছিয়াশি। তিনি বীরেন পালের ভাই। তিনিও মৃৎশিল্পের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। গণেশ পালের তিন ছেলে বিপ্লব পাল, তড়িৎ পাল ও জয়ন্ত পাল। তিন জনেই এখন ঘূর্ণীর সেরা মৃৎশিল্পী। বর্তমান বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ওঁরা যেমন মৃৎশিল্পে নতন নতুন রূপ দেন তেমনি নগরের মৃৎশিল্পের পুরনো ঘরানাকে ধরে রাখতে এঁদের সমান প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে কেউই প্রতিমা তৈরিতে বাপের মতো তেমন উৎসাহী নন। প্রতিমা শিল্পী হিসাবে ঘূর্ণী অঞ্চলে এখন যেসব শিল্পীর নাম উঠে আসে, তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযাগ্য হলো প্রয়াত জীতেন পালের ছেলে সুদীপ্ত পাল, প্রয়াত বীরেন পালের ছেলে সুবীর পাল, ভাইপো বাবলু প্রয়াত মুক্তি পালের ছেলে মৃগাঙ্ক পালের ছেলে সুদীপ্ত পালের কাজ আর বাবার মতোই। প্রকৃতির চেয়ে মাটির নানা আকার বা আকৃতির দিকেই তার ঝোঁক বেশি। ঘূর্ণীর প্রতিমা শিল্পীদের মধ্যে এখন সবচেয়ে ব্যস্ত শিল্পী শংকর পাল। শংকর পাল কিছুদিন যামিনী পালের কাছে ছিলেন আবার কিছুদিন কুমোরটলিতে। কৃষ্ণনগরে বসে এখন তিনি বেশ কয়েকটি বড়ো দুর্গামূর্তি নির্মাণ করেন। মূর্তিগুলির প্রায় সবই বাইরে যায়। যেসময় এইসব মূর্তি তৈরি হয় সেসময় তাঁর কাছে এত মানুষ কাজ করে, যে দেখলে একটা বড়োসড় ইন্ডাস্ট্রি বলেই মনে হবে। মৃৎশিল্পীরা যখন প্রতিমা দৈরিতে ব্যস্ত থাকে, তখন প্রকৃপক্ষে মৃৎশিল্প একটা যৌথ শিল্পকাজে রূপ পায়। নানা সম্প্রদায়ের মানুষ তখন সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিমরাও বাদ যায় না। শংকর পালের আগে বাড়ি ছিল কুমারপাড়া অর্থাৎ এখনকার ষষ্ঠীতলায়। এই ষষ্ঠীতলার ঘাটেরধারেই একসময় থাকতেন কার্তিক পালের ঠাকুরদা পরাণচন্দ্র পালও।

কুমোরপাড়া বা ষষ্ঠীতলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৃৎশিল্পী নিমাই পালের মতো কুমোরপাড়াই হলো প্রকৃতপক্ষে 'কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ঘর'। কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পীদের পূর্বপুরুষ অতীতে মূলত মাটির হাঁড়ি কলসি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতেই কুমোরের চাকা ঘুরত। তখন অবশ্য প্রতিমা বা মাটির পুতুলের তেমন চল হয়নি। আগে যাঁরা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ পাল, জানকীনাথ পাল, ভোলানাথ পাল উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এঁরা বা এঁদের উত্তর পুরুষ সরাসরি মাটির পুতুল এবং প্রতিমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এমন কি কেউ কেউ হয়েওঠেন কৃষ্ণনগরের প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী। সেই সব প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পীদের মধ্যে গোপেশ্বর পাল, ভোলানাথ পাল, সত্য পাল, শিব পাল ও অশ্বিনীপালের নাম করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই মূলত মাটির প্রতিমা তৈরিতে দক্ষ ছিলেন। তবে গোপেশ্বর পাল ছোট ছোট শিবদূর্গা, কালী বা অন্যান্য পুতুলও বানাতেন। এই গোপেশ্বর পাল আর ঘূর্ণীর গোপেশ্বর পালও অতীতে চাষাপাড়ার জগদ্ধাত্রী বানাতেন বলে শোনা যায়। এই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বুড়িমা নামে খ্যাত।

কানাইপালের দাদা বলাই পাল বেঁচে নেই। তিনিও একজন মৃৎশিল্পী ছিলেন। জানা যায়, প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর 'দেবী' সিনেমায় বলাই পাল ও কানাই পালের তৈরি দেবীমূর্তির ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া কলকাতার গড়পারের বাড়িতে গিয়ে সত্যজিৎ রায়ের মাকে মাটির পুতুল তৈরি করা শেখাতেন যে নিতাই চরণ পাল (এন. সি. পাল) তিনিও দীর্ঘদিন এই কুমোরপাড়াতেই ছিলেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'যখন ছোটছিলাম' বইতে এন.সি. পালের কথা উল্লেখও করেছেন। কুমোরটুলিতে ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের মধ্যে একটা দেওয়া নেওয়া চলতে থাকে। এই কুমোরপাড়ার সুধীর পালেরও কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পকেন্দ্র ছিল। নিতাইচন্দ্র পাল বা সুধীর পাল কেউই বেঁচে নেই। তাঁদের উত্তর পুরুষ মৃৎশিল্প থেকে দূরে সরে গিয়েছে। কুমোরপাড়ার রাম পাল মারা গিয়েছেন, তাঁর ভাই শ্যামেরও শরীর ভালো নয়। কুমোর পাড়ার পাশে ছুতোর পাড়ায় ছিলেন প্রভাত চন্দ্র (পট) পাল। তিনি বেঁচে নেই। তাঁর ছেলে অক্ষয় পাল সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির মোড়ে প্রতিমা বানায়। অন্য ছেলেরা বাড়িতেই মাটির কাজ ও প্রতিমার কাজ ও সাজ নিয়ে আছে। কানাই পাল বেঁচে থাকলেও তিনি অসুস্থ। তাঁর ছেলে প্রদীপ পাল ও চঞ্চল পাল। দুজনেই এখন কৃষ্ণনগরের প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী। বিশেষ করে বড়ো বড়ো প্রতিমা তৈরিতে তাঁদের মতো দক্ষতা কৃষ্ণনগরের আর কারও নেই। চঞ্চল এখন চাষাপাড়ার বুড়িমা তৈরি করে। প্রতিমার মুখ কিন্তু বাবার বানানো। একসময় মৃৎশিল্পী গোপাল পাল যেখানে মাটির কাজ করতেন সেখানে এখন চঞ্চল ও প্রদীপ মূর্তি বানানো ছাড়াও অন্যান্য মাটির কাজ করে। কানাই পালের দাদা প্রয়াত বলাই পালের ছেলে অলোক পালও কুমোরপাড়াতেই থাকে। সেও একজন মৃৎশিল্পী। ষষ্ঠীতলার কুমোর পাড়ার পুরনো মৃৎশিল্পীদের মধ্যে এখনও অল্প বিস্তর কাজ করে চলেছেন নির্মল পাল ও নিমাই পাল। নির্মল পাল একজন ভালো শিল্পী হলেও একদমই প্রচার পাননি। যেমন নিমাই পাল— দু'বার আমেরিকা থেকে ঘুরে এলেও একজন মৃৎশিল্পী হিসাবে যতটা সম্মান তাঁর পাওয়া উচিত ছিল সে সম্মান তিনি পাননি। তাঁর নির্মিত পুতুলমূর্তির যে বিশেষ আদল তা কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের গর্ব। কেমন যেন হাসি হাসি অথচ গম্ভীর নারীপুরুষের মেশানো একটা আধ্যাত্মিক ভাব সেইসব মূর্তির চোখেমুখে। অন্যদিকে স্রষ্টাকে না জানালেও কানাই পালের উদ্ভাবিত দেবীমূর্তি বুড়িমার টানাটানা চোখের প্রশংসা এখন সর্বত্র। সৃষ্টি সামনে এলেও স্রষ্টা থেকে গেছেন সেই আড়ালে। যেমন নুড়িপাড়ার তারাপদ পালের কথা আর কজনই বা মনে রেখেছে।

এরকম ঘটনা কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির প্রতিমা শিল্পীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এখন রাজবাড়ির দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মাণ করেন সাধন পাল। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগরের নতুনবাজার অঞ্চলে। নতুনবাজারের অন্যান্য মৃৎশিল্পীরা হলেন মহেশ পাল, সোমনাথ পাল, সুবল পাল, দেবেন পাল। সোমনাথ পাল রায়পাড়ার দুর্গা প্রতিমা গড়েন। মূলত প্রতিমা শিল্পী হিসাবে নতুনবাজার অঞ্চলের এই মৃৎশিল্পীদের মধ্যে সুবল পালের বেশ নাম ডাক। ঘূর্ণীর শিল্পীদের মতো ততটা সূক্ষ্ম না হলেও মাটির আঁকাবাঁকা লতানো কাজে তিনি যথেষ্ট দক্ষ। উজ্জ্বল এবং কিছুটা রক্তাভ রঙের প্রতি দুর্বলতা শিল্পীর প্রতিমাগুলিকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। তিনি এখনও সমানে কাজ করে চলেছেন। অন্যদিকে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিয়ে এত হৈচৈ চারিদিকে, কিন্তু সাধন পালের কথা কজনেই বা জানে। একই অবস্থা হয়েছে বদ্যিনাথ পালের। বৈদ্যনাথ পাল, অমূল্য পাল দুজনেই আজ আর বেঁচে নেই। তাঁদের মৃত্যুর পর থেকে সাধন পালই রাজবাড়ির প্রতিমা গড়ছেন। তিয়াত্তর - চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ সাধন পাল আক্ষেপ করে বলেন— আগে কত ধরণের পুজো হতো রাজবাড়িতে, আর এখন মাত্র দুটো পুজোতে গিয়ে ঠেকেছে। আগে প্রতিমা তৈরির জন্য গঙ্গামাটি আসত, এখন সেসবও নেই। সারাবছর ধরে কয়েকটা প্রতিমা বানিয়ে এব টুকটাক মাটির পুতুল গড়ে কোনো রকমে দিন চলে। একই আক্ষেপ শোনা যায় শিল্পী লক্ষণ পালের কথায়। আনন্দময়ীতলা ছাড়িয়ে গেলেই লক্ষণ পালের ঘর। তাঁর বাবা গোবিন্দচন্দ্র পালও ছিলেন একজন মৃৎশিল্পী। লক্ষণ পালের কথা শুনতে শুনতে দেখা গেল একটা আঠারো - উনিশ বছরের ছেলে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে বারমুডা পরে কালোরঙের গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ঘড়ি হাতে রীতিমতো আড্ডা দিতে দিতে দিব্যি বিশ্বকর্মাকে কার্তিক করে তুলছে। ছেলেটি লক্ষণ পালের ভাইপো। তার কাছে গিয়ে জানা গেল সে দুপুরবেলা খেতে বসে মোবাইল ফোনে একটি কার্তিক রেডি করতে হবে এরকম অর্ডার পেয়েছে। রাতেই পুজো হবে। সে ভেঙে ভেঙে দাঁড়ানো দুটি বিশ্বকর্মার হাত কার্তিকের মতো করে ফেলেছে এবং বিশ্বকর্মার পিছনে দাঁড়ানো হাতিটার মাথা কেটে নামিয়ে দিয়ে কাদা লাগাতে শুরু করেছে। সব দেখে শুনে মনে হলো, এখানকার মৃৎশিল্পীদের ঘরগুলোয় আগের মতো অনেককিছুই এখনো রয়ে গেছে। শুধু কারও কারও পরনে বারমুডা, হাতে মোবাইল উঠেছে এই যা। প্রয়োজনে বিশ্বকর্মাকে কার্ত্তিক ও লক্ষ্মীকে সরস্বতী করার মতো কাজ আগেও পালেরা করত বলে শোনা যায়। তবে ভাঙাগড়ার সঙ্গে মৃৎশিল্পের সম্পর্ক কোনোকালেই তেমন ছিল বলে মনে হয় না।

মৃৎশিল্পের মূল জায়গাটা একই থাকলেও ভেতরে ভেতরে এর পরিবর্তনও হয়েছে যথষ্টে। বিশেষ করে ঘূর্ণী অঞ্চলে মৃৎশিল্পের মোটামুটি একটা বাজার গড়ে ওঠার ফলে এই অঞ্চলেই সেই পরিবর্তন বিশেষ করে চোখে পড়ে। যেসব পর্যটক মৃৎশিল্পের জন্য কৃষ্ণনগরে আসে, তারা মূলত ঘূর্ণী অঞ্চলেই যায়। এখানেই মৃৎশিল্প প্রদর্শনের অনেকগুলো শোরুম তৈরি হয়েছে। দেশও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে যে ব্যাবসায়িক যোগাযোগ তা প্রধানত ঘূর্ণী অঞ্চল থেকেই হয়। ফলে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মাটির তৈরি পুতুলের পাশাপাশি প্লাস্টার অব্ প্যারিসের তৈরি পুতুল একটা বড়ো জায়গা করে নিয়েছে। ঘূর্ণীর শিল্পীদের মতে প্লাস্টার অব্ প্যারিসের কিছু সুবিধাও আছে। ছাঁচে ফেলে খুব দ্রুত নির্মাণ করা যায়, এবং মাটির মতো পোড়ানোর কোনো ঝামেলা নেই। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত শিল্পী গণেশ পালের ছেলে বিপ্লব পাল মনে করেন, আগেকার কাঁইআঠার চেয়ে এখনকার ফেভিকলের ব্যবহারিক কিছু সুবিধা আছে। কাঁইআঠা দু-তিন দিনেই পচে যায়, কিন্তু ফেভিকলের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা যেমন নেই, তেমনি নেই আঠা তৈরির ঝামেলা। ফলে শুধু ফেভিকল নয়, সুবিধা অনুযায়ী রেডি এসিয়ান পেন্টস' ও ব্যবহার করছেন এখনকার মৃৎশিল্পীরা। এর মধ্যে আবার যাঁরা মূলত মূর্তি যা ভাস্কর্য নির্মাণ করছেন, মাটি তাঁদের প্রধান অবলম্বন হলেও শেষ পর্যন্ত সিমেন্ট, পাথর, ব্রোঞ্জ ফাইবার সবই কাজে লাগাচ্ছেন তাঁরা। তবে এর মধ্যেও মৃৎশিল্পীদের মাটির কাজের দক্ষতা কিন্তু একটুও হারিয়ে যায়নি। ঘূর্ণীর শোরুমগুলোতে নানা রকমারি পুতুলের ভিড়ে 'নট্ ফর সেল' লেখা সূক্ষ্ম মাটির কাজগুলি দেখলে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে এখন সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হলো ষষ্ঠীতলার কুমোরপাড়া মৃৎশিল্পীদের। একসময় প্রতিমা

বিক্রির যে বাজার এই পাড়ায় ছিল, তার পুরোটাই চলে গিয়েছে পালপাড়া নতুনবাজার অঞ্চলে। আগে কৃষ্ণনগরের বেশির ভাগ পাড়ারই বারোয়ারি বা ক্লাবের প্রতিমা তৈরি হতো এই ষষ্ঠীতলায়। পুজোর আগের দিন বিকেলে বা রাতে সেইসব পাড়ার ছেলের দল মোটা মোটা বাঁশে বেঁধে তাদের প্রতিমা নিয়ে যেত পুজো মণ্ডপে। প্রতিমাবাহী ছেলেদের ঘন ঘন চিৎকার চেঁচামেচিতে পাড়া কেঁপে উঠত। এখন সে চিৎকার আর শোনা যায় না। এখন এই পাড়ায় যে কয়েকজন মৃৎশিল্পী প্রতিমা গড়ে তারা নিজেরাই চলে যায় অন্য পাড়ায়। সেখানেই মাটি মেখে রঙগুলো ভ্যান বিক্সায় চাপিয়ে নিয়ে যায়। কাজ করতে করতে কী করে সময় বাঁচাতে হয় তারও এখন অনেকটা রপ্ত করে নিয়েছে। একজন শিল্পী বাড়িতে প্রতিমা না বানিয়ে মণ্ডপে প্রতিমা বানানোর কারণ হিসাবে বললেন, তাঁরা তিন ভাই— প্রত্যেকে বিয়ে করার পর আলাদা। একটা উঠোন তিনটুকরো হলে বাড়িতে প্রতিমা বানানো যে উঠে যাবে এটা স্বাভাবিক। তবে আয় বাড়াতে ছোট ছোট ঘরে মৃৎশিল্পের অনুসারী শিল্প হিসাবে সাজ শিল্প জায়গা করে নিয়েছে। আগে শুধুমাত্র আনন্দময়ীতলা, বাগদীপাড়ার মতো কয়েকটি পাড়াতেই এই শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়াও আছে সারাবছর ধরে মাটির ফল বানানো। এর একটা বড়ো বাজার আছে কৃষ্ণনগরের বাইরে।

কালোর অমোঘ গতিতে এইরকম কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও সাধারণ মৃৎশিল্পীরা খড়িমাটি, কাঁইআঠা, পিউরি (হলুদ রঙ), এলামাটি, গিরিমাটি, ডেলা নীল, ভারী লাল, এ্যারারুট, বার্নিস, তার্পিন তেল ইত্যাদি নিয়েই বেঁচে আছে। প্রতিমা শুকনোর জন্য সেই লোহার তারজালি মধ্যে জ্বলন্ত কয়লা বা ঘুঁটে রেখে ভিজে স্থানে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখনও। ব্লো ল্যাম্পের ব্যবহার আগেও ছিল এখনও আছে। কেউ কেউ অবশ্য দ্রুত শুকনোর জন্য গ্যাল সিলিণ্ডারের ব্যবহার করছেন। এছাড়া স্প্রে - মেশিন ব্যবহার করে রঙ করতে এখনকার প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পীকেই দেখা যাচ্ছে। এটা একেবারে সাম্প্রতিক কালের সংযোজন। চোখ আঁকা বা অলংক রণের সময় অনেকেই এখন নানা রঙের পোস্টার কালার ব্যবহার করছেন। যেসব মৃৎশিল্পী ভালো ছবি আঁকতে পারেন বা যেসব মৃৎশিল্পীর বাড়ির কেউ আর্ট কলেজে থেকে পাশ করে এসেছে, তারা মৃৎশিল্পে নতুন নতুন রঙের ব্যবহার ও রূপের মিশ্রণ ঘটিয়ে গতানুগতিক জায়গা থেকে মৃৎশিল্পকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করে চলেছেন নানাভাবে। শিল্পী নিমাই পাল অবশ্য এখনকার শিল্পীদের ধৈর্যহীনতার কথা বললেন। বললেন, আগে এখনকার মতো এত ধরণের রঙ পাওয়া যেত না। অনেকসময় প্রাকৃতিক কোনো উপাদান সংগ্রহ করে বা অনেক পরিশ্রমে রঙ তৈরি করে নিতে হতো। তার কথায়, সেরঙের স্থায়িত্ব এবং ভাবটিই ছিল আলাদা। এখনকার রঙে অনেক ভেজাল মিশে গিয়েছে। শিল্পী নিমাই পালের কথার সূত্র ধরে বলা যায়— কে মৃৎশিল্পী এবং কে মৃৎশিল্পী নয়, এটাই এখন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বড়ো ভেজাল। এই শিল্পে সম্প্রতি অনেক মিড্লম্যান এসেছে। মৃৎশিল্পীর সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই সেইসব মিড্ল ম্যানদের খপ্পরে পড়ে অনেকসময় জাতশিল্পীও হালে পানি পাচ্ছেন না। মৃৎশিল্প হয়ে উঠেছে তাদের কাছে 'মাল' বা কমোডিটি। নানারকমের চীনাপুতুলের ছাঁচ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ঈর্ষা, শোষণ সবই আছে। পুরস্কার পাইয়ে দেবেন বলে শিল্পীদের কাছে কেউ বড়ো - সড়ো অর্থও চেয়ে বসছেন আজকাল। অর্থের দিকে তাকাতে গিয়ে কোনো শিল্পী মন্দির - অলংকরণের মতো কোনো কাজে কৃষ্ণনগর ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন। যখন ফিরে আসছেন তখন তার আগের সে শারীরিক অবস্থাও নেই, হাতে পয়সাও নেই। আগে যেমন কোনো কোনো মৃৎশিল্পী বড়ো বাড়ির কার্নিশে লতাপাতার নক্সা, বিভিন্ন ভঙ্গির নারীমূর্তি, থামের ওপর সিংহ ইত্যাদি নির্মাণ করে পয়সা উপার্জন করতেন, তেমনি এখনও কেউ কেউ বিয়ের তত্ত্ব - সাজানোয় হাত লাগাচ্ছেন। সন্দেশের মাছ বা বুড়োবুড়ি ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে তাঁদের হাত দিয়েই। আবার কোনো শিল্পী শত অভাব সত্ত্বেও মৃৎশিল্পকে ভালোবেসে কাদামাটি নিয়ে সৃষ্টির আনন্দেই ডুবে আছেন। এইরকম নানা দুঃখ - দুর্দশা, যন্ত্রণা - ভালোবাসার কাহিনি আছে মৃৎশিল্পীদের অন্দরমহলে। মৃৎশিল্পীদের সীমাহীন দারিদ্র্যের কথা আর না বলাই ভালো। আশার কথা, সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নী দুনিয়ার চোখ ঝলসানো আলোর মঝে এখনও লম্প হাতে প্রতিমার চক্ষুদান করে চলেছেন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা। লম্ফটা তাঁদের চাইই চাই। লম্ফের আলোতেই নাকি তাঁরা সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পান।